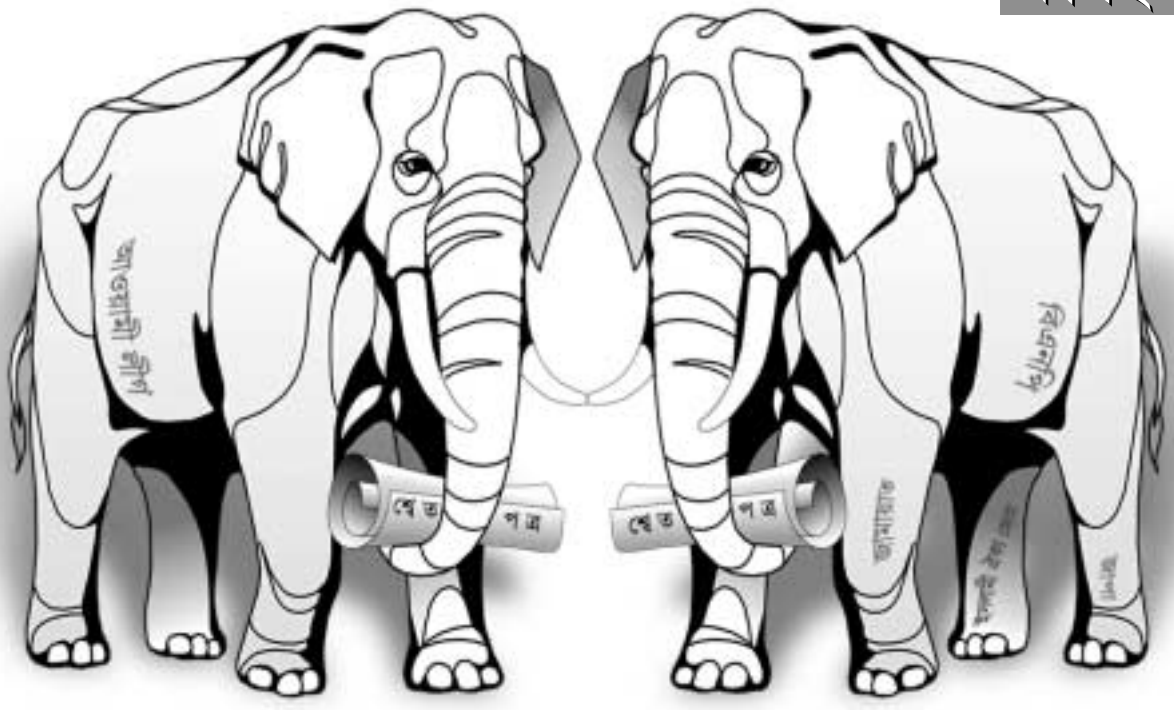

দুই শ্বেতহস্তীর লড়াই

জনগণের খরচ ১৫০০ কোটি টাকা

গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলো যেন বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে জনগণের জন্য। হয়ে পড়ছে শ্বেতহস্তী। তাদের পেছনে পাঁচ বছরে ন্যূনতম ব্যয় ১৫০০ কোটি টাকা। এই টাকা যায় সাধারণ মানুষের পকেট থেকে। অথচ তারা নির্বাচিত হয়ে ভুলে যান জনগণের কথা। ব্যস্ত হয়ে পড়েন দুর্নীতিতে। দলের নেতারা যে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতিতে জড়িয়ে আছেন তা বেরিয়ে এসেছে দু'পক্ষের শ্বেতপত্র নিয়ে লড়াইয়ে... লিখেছেন অম্লান দেওয়ান ও অনিরুদ্ধ ইসলাম

গল্প নয়, একটা সত্য কাহিনী বলি। মনসুর সাহেব তার বাসার নিরাপত্তা, সন্তানদের লেখাপড়া, ভবিষ্যৎ সবকিছু দেখাশোনা করার জন্য একজন ম্যানেজার রাখলেন পাঁচ বছরের চুক্তিতে। মনসুর সাহেবের যাবতীয় বিষয় লক্ষ্য রাখাও ম্যানেজারের দায়িত্ব। কারো কোনো সমস্যা হলে তা দ্রুত ঠিক করে দিতে পারবে বলে ম্যানেজার চাকরিটা নিল। মাস শেষে সে বেতন ঠিকই নেয় কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করে না। উল্টো মনসুর সাহেবের বাসা থেকে এটা-সেটা চুরি হয়ে যায়। স্ত্রী, সন্তানদের নিরাপত্তাও থাকছে না দেখে মনসুর সাহেব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। চার বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সেই ম্যানেজার তার বাসা প্রায় দখল করেই ফেলল। অথচ বেতন নিচ্ছে মনসুর সাহবের পকেট থেকেই। পাঁচ বছর শেষে ম্যানেজার পাল্টানো হলো। এবারও একই অবস্থা। নিস্তার নেই মনসুর সাহেবের। বেতন দিয়ে যেন চোর নিয়োগ করেছেন তিনি। অথচ এমন ম্যানেজারের হাত থেকে যেন মুক্তি নেই।

পাঠক নিশ্চয়ই ভাবছেন মনসুর সাহেব এত বোকা, জেনেশুনে এমন লোক রেখেছেন। আর যারা একটু বেশি চিন্তা করেন তারা হয়তো ভাবছেন কেনই বা এমন ম্যানেজারকে রাখতে বাধ্য হচ্ছেন মনসুর সাহেব। নিশ্চয়ই তার কোনো দুর্বলতা আছে। না হলে কেন তিনি জিম্মি থাকবেন এমন লোকের কাছে?

পাঠক নিজেকে মনসুর সাহেবের জায়গায় নিয়ে পরিস্থিতিটা একটু চিন্তা করতে পারবেন কি? না, আপনার সঙ্গে সাপ্তাহিক ২০০০ কৌতুক করছে না। মনসুর সাহেব হচ্ছেন, বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ; তার বাসা, স্ত্রী, সন্তান হচ্ছে রাষ্ট্র এবং সেই বেতনভুক্ত চোর ম্যানেজার হচ্ছে আমাদের সম্মানিত সরকার অথবা সরকারি দল। জনগণের টাকা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সংসদ সদস্যদের বেতন দেয়া হয়। দেয়া হয় আরাম-আয়েশের নানা সুযোগ-সুবিধা। এক একটি নির্বাচিত সরকারের ব্যয় মেটাতে জনগণের পকেট থেকে বেরিয়ে যায় ১৫০০ কোটি টাকা। অথচ তারা জনগণকে কী দিচ্ছে? এক পক্ষ অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে প্রকাশ

করছে দুর্নীতির দীর্ঘ তালিকা। তাদের মাধ্যমে প্রকাশিত এই শ্বেতপত্র দেখেই বোঝা যায়, আমরা ১৫০০ কোটি টাকা খরচ করে রেখেছি 'চোর ম্যানেজার', যে আমাদের হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি আত্মসাৎ করছে। এই দুর্নীতিবাজদের পেছনে আমাদের টাকা কিভাবে ব্যয় হচ্ছে? 'চুরি' করার জন্য আমরা তাদের কত টাকার বেতন দিচ্ছি? কত টাকার সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছি?

১৫০০ কোটি টাকার হিসাব

প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সাংসদরা কত টাকার বেতন পান, কয়টা গাড়ি পান, কতজন পিএস-এপিএস তাদের, তাদের বাগানে কতজন মালি কাজ করে, নিরাপত্তার পেছনে কত ব্যয় ইত্যাদি অনেক বিষয়ের হিসাব জনগণ কখনই জানতে পারে না। যদিও জনগণই এ অর্থের যোগানদার। 'অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট'-এর নামে এসব তথ্য গোপন রাখা হয়। আর সেটাই স্বাভাবিক। কেননা এদের পেছনের খরচের নমুনা দেখলে মনে হবে না বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলোর একটা। তারপরও এসব গোপন তথ্য জানার প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বার বার যোগাযোগ করলেও বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। কয়েকবার তথ্য দেবার আশ্বাস দেয়া হলেও শেষে জানানো হয়েছে– 'সরি, এসব তথ্য নেই। থাকলেও দেয়া যাবে না।'

বিএনপি প্রকাশিত শ্বেতপত্রে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ও জ্বালানি খাতে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে ক্ষমতার অপব্যবহারের

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে দেশের প্রধানমন্ত্রী বেতন পান ২২ হাজার টাকা। দেশ-বিদেশে তার সমস্ত সফরের ব্যয়ভার বহন করে সরকার। এছাড়া তার সফরসঙ্গীদের ব্যয়ভারও বহন করে সরকার। প্রাইম মিনিস্টারস রেমুনারেশন এন্ড প্রিভিলেজ অ্যাক্ট, ১৯৭৫ (১৯৯৬-এ সংশোধিত) অনুযায়ী যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন সচিব, উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন ব্যক্তিগত সচিব, জনসংযোগ কর্মকর্তা, সহকারী ব্যক্তিগত সচিব, দু'জন স্পেশাল সিকিউরিটি অফিসার, ৩ জন ব্যক্তিগত সহযোগী, ব্যক্তিগত চিকিৎসক, হাউজ কিপার, ফটোগ্রাফার, জমাদার, এমএলএসএস, খিদমতগার, কুক, খালাসী, হাউজ ক্লিনার, মালিসহ অন্তত ৫০ জন বিভিন্ন পদমর্যাদার ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর জন্য কাজ করেন। এছাড়া স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স তো রয়েছেই। এ সবকিছু মিলিয়ে একজন প্রধানমন্ত্রীর পেছনে পাঁচ বছরে ব্যয় হয় ২০০ কোটি টাকা। সব সময় সব খাতে বাজেট অনুযায়ী ব্যয় হয় না। বিশেষ করে আপ্যায়নের বিষয়ে আমাদের সরকার প্রধানরা খুব উদার।

শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপ্যায়ন বাবদ প্রতিদিন ব্যয় হয়েছে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা। প্রধানমন্ত্রীর জন্য বছরে এক কোটি ৪৪ লাখ টাকা পর্যন্ত সর্বোচ্চ বরাদ্দ থাকে। সে হিসাবে বছরে খরচ হওয়ার কথা ৭ কোটি ২০লাখ টাকা। কিন্তু গত ৮ বছরে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে আপ্যায়ন খাতে খরচ হয়েছিল ১২ কোটি ৫০ লাখ টাকারও বেশি অর্থ।

সরকারি নথিপত্র ঘেটে দেখা গেছে, ১৯৯৬ সালের জুলাই থেকে ২০০১ সালের জুন পর্যন্ত সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মোট ৫২ বার বিদেশ সফর করেছেন। এর মধ্যে তিনি কোনো কোনো দেশ একের অধিকবার সফর করেন। এসব সফর বাবদ সরকারের মোট অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ ৬০ কোটি ৮৭ লাখ ৯১ হাজার ৩৩৩ টাকা।

'৯১-'৯৬-এর বিএনপি সরকার প্রধান খালেদা জিয়াও একই কাজ করেছিলেন। তিনিও সরকারি অর্থের অপচয় করে নিকটজনদের নিয়ে অর্ধশতাধিক বিদেশ সফর করেছেন। আর এতে সরকারের খরচ হয়েছে কোটি কোটি টাকা। এসব সফরে প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে গুরুত্ব পান তার নিকটজন কিংবা আত্মীয়-স্বজনরা।

রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। রাষ্ট্রপতির আবাস ও কর্মস্থল বঙ্গভবনের পিয়ন-জমাদার থেকে শুরু করে মিলিটারি অ্যাটাসে পর্যন্ত বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, আপ্যায়ন ভাতা ইত্যাদি মিলিয়ে রাষ্ট্রপতির পেছনে ৫ বছরে ব্যয় ১০০ কোটি টাকারও বেশি। অবশ্য বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের রাষ্ট্রপতি হবার আগে বঙ্গভবনে টাকা খরচের কোনো হিসাব ছিল না। সাহাবুদ্দীন আহমদ রাষ্ট্রপতি হবার পর বঙ্গভবনে ঢুকেই চালু করেন বঙ্গভবনে অডিটের ব্যবস্থা। এর আগে বঙ্গভবনে কেন খরচ হলো, কোথায় খরচ হলো, কিভাবে হলো তার উত্তর কোনো অডিটর জানতে চাননি। বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের উদ্যোগে করা অডিটে ১৯৯৪-'৯৫, '৯৫-'৯৬ ও '৯৬-'৯৭ অর্থবছরে বঙ্গভনের হিসাবে বেশ কিছু আর্থিক দুর্নীতির ঘটনা ধরা পড়ে। দেখা যায় বঙ্গভবনের গোলাপ বাগানে বালু ভরাট, উন্নতমানের গাছ লাগানো কিংবা রাস্তায় বিটুমিন কার্পেটিং-এর মতো কাজেও আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে। আপ্যায়ন, সাজসজ্জা ইত্যাদি খাতের দুর্নীতি তো ছিলই।

মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীদের বেতন-ভাতা ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিয়ে প্রথম আইন প্রণীত হয় ১৯৭৩ সালে। সে সময় আইনটির শিরোনাম দেওয়া হয় 'দ্য মিনিস্টারস, মিনিস্টারস অফ স্টেট এন্ড ডেপুটি মিনিস্টারস (রিমুনেরেশান এন্ড প্রিভিলেজেস) অ্যাক্ট ১৯৭৩। পরবর্তী সময়ে একাধিকবার আইনটি সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্ধন করা হয়। মন্ত্রিসভার সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে আইনটির সর্বশেষ সংশোধন করা হয় গত বছরের ২৬ জানুয়ারি। সংশোধিত আইন অনুযায়ী মন্ত্রীদের বেতন ১২ হাজার টাকার পরিবর্তে ১৮ হাজার এবং উপমন্ত্রীদের বেতন ১০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়। এ বেতনের বিপরীতে তাদের ট্যাক্সও মওকুফ করার কথা বলা হয়েছে।

এ আইনে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীরাসহ তাদের স্ত্রী, পুত্রকন্যাসহ পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। মন্ত্রিসভার সদস্যরা বাসাভাড়া, গাড়ি, টেলিফোন, বিদ্যুৎ , গ্যাস. যাতায়াত ভাতাসহ নানা সুবিধাদি পাবেন বলে আইনে উল্লেখ করা হয়েছে। বিবিধ খাতে প্রতিমাসে একজন মন্ত্রী ৩ হাজার টাকা, একজন প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী ২ হাজার টাকা করে পাবেন। সরকারি গাড়ি পাবেন। গাড়ির জ্বালানি ও মেরামত, ড্রাইভার, ড্রাইভারের বাসস্থান ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় মেটানো হবে সরকারি কোষাগার থেকে। মন্ত্রিসভার সদস্যদের পেছনে সবচাইতে বড়ো অংকের অর্থ ব্যয় হয় বাসভবনের পেছনে। নীতিমালা অনুযায়ী একজন পূর্ণমন্ত্রী বাসভবন সজ্জিতকরণে ১ লাখ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এতে বাসভবনে তিনটি শয়ন কক্ষের জন্য খাট, মেট্রেস, তোষক, আলনা, ড্রেসিং টেবিল, পাটের তৈরি কার্পেট, ড্রয়ারসহ আলমারি, তোয়ালে রাখার র‍্যাকসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম সরবরাহের কথা উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া ড্রয়িং রুম, ডাইনিং রুম, বারান্দা ও রান্নাঘরের আনুষঙ্গিক আসবাবপত্র তো থাকছেই। বাসভবনের বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, টেলিফোন বিল মেটানো হবে সরকারি কোষাগার

থেকে। এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট অংক উল্লেখ নেই। মন্ত্রীদের দপ্তর ও বাসভবনে অতিথিদের যাবতীয় আপ্যায়নের ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বহন করবে। বাড়ি ব্যবস্থাপনার জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে তিন মাসের বাড়ি ভাড়ার সমান অর্থ।

এই আইনে বলা হয়েছে, মন্ত্রী হিসেবে কর্মক্ষেত্রে যোগদানের পর যদি সরকারি বাসভবন পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে একজন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী নিজ পছন্দমতো বাড়িভাড়া নিয়ে বসবাস করতে পারবেন। সে ভাড়া মেটাবে সরকার। এক্ষেত্রে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৭ হাজার ৫শ' টাকা (মন্ত্রীর) ও ১৫ হাজার টাকা (প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী)। ভাড়া করা কিংবা নিজ বাড়িতে মন্ত্রিসভার কোনো সদস্য বসবাস করলে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে সরকারি খরচে নির্মাণ করা যাবে নিরাপত্তা শেড। এ শেড নির্মাণে বরাদ্দ রয়েছে ৪০ হাজার টাকা। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সরকারি খরচে ভ্রমণের ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে ভিআইপি মর্যাদা। ট্রেনে ভ্রমণ করলে দুই কিংবা চার শয্যার এয়ার কন্ডিশনড কম্পার্টমেন্ট রিজার্ভ ছাড়াও পাবেন রেল বিভাগের দুইজন বিশেষ সহকারী। লঞ্চে ভ্রমণের ক্ষেত্রেও পাবেন একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা। জনস্বার্থে বিমানে দেশে-বিদেশে ভ্রমণের কথাও উল্লেখ করে আইনে বলা হয়েছে, মন্ত্রিসভার যে কোনো সদস্য প্রয়োজনবোধে এরোপ্লেন বা হেলিকপ্টার রিকুইজিশন করতে পারবেন। তবে আকাশপথে ভ্রমণের পেছনে ইনস্যুরেন্স সুবিধাসহ ব্যয় করা যাবে বছরে ৫ লাখ টাকা। প্রয়োজনবোধে এর বেশিও ব্যয় করা যাবে কিন্তু তা হবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধা লাভের পাশাপাশি একজন মন্ত্রী ব্যয় করতে পারবেন প্রয়োজনীয় অর্থ। প্রচলিত আইনানুযায়ী একজন মন্ত্রী তার কার্যালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারীর সমান পদাধিকারের একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি, দুইজন ব্যক্তিগত সহকারী, একজন জমাদার ও একজন আর্দালি পাবেন। এছাড়া আরো দুইজন সহকারী পছন্দ মতো নিয়োগ দিতে পারেন একজন মন্ত্রী। বাসভবনের জন্য কুক (পাচক) নিয়োগেও মন্ত্রীর ইচ্ছাই প্রাধান্য পাবে। আর এসব ব্যক্তির বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদির পেছনে অর্থ ব্যয় করবে সরকার। একজন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর পেছনে এতো বিপুল আয়োজন ও সুযোগ-সুবিধা রাখার পাশাপাশি তাদের স্বেচ্ছাধীন অনুদান রাখা হয়েছে ১ থেকে ২ লাখ টাকা।

মন্ত্রীরাও আপ্যায়নের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর মতই উদার। আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী তোফায়েল আহমদ, শাহ এ এম এস কিবরিয়া ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জু সহ আরো বেশ কয়েকজন একদিনেই আপ্যায়ন বাবদ ব্যয় করেছেন ২ থেকে ৩ হাজার টাকা। অথচ নিয়মানুযায়ী একদিনে নয় এক মাসের খরচ হওয়ার কথা এ পরিমাণ অর্থ। বর্তমান মন্ত্রিসভার সদস্যরাও একই পথে এগুচ্ছেন। সরকারি টাকায় দলীয় নেতাকর্মীদের আপ্যায়নের প্রলোভন এড়াতে পারছেন না তারাও।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মন্ত্রিসভার সদস্যদের পেছনে বরাদ্দ ও সম্ভাব্য ব্যয় হিসাব করে দেখা গেছে, আগামী ৫ বছরে ৬০ জনের বিশাল মন্ত্রীবহরের পেছনে ব্যয় হবে ৪০০ কোটি টাকার মতো।

অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো মন্ত্রিসভার বেতন, বাড়িভাড়াসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার জন্য চলতি ২০০১-২০০২ অর্থবছরে মন্ত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট বাজেটের অতিরিক্ত ২০ থেকে ২৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে। ১০ অক্টোবর ৬০ সদস্যদের শপথ গ্রহণের ৩ দিন পর ১৪ অক্টোবর বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধিদল দেখা করে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী সাইফুর রহমানের সঙ্গে। বিশ্বব্যাংকের আবাসিক প্রতিনিধি ফ্রেডরিক টি টেম্পলের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদল দেশের ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থা সত্ত্বেও বিশালাকৃতির মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে তাদের আপত্তি তুলে ধরে। ফ্রেডরিক টি টেম্পল বিশালাকৃতির এ মন্ত্রিসভাকে অযৌক্তিক বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন,

হাইলাইটস

বিএনপি'র শ্বেতপত্র

সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের পাঁচ বছরে ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি ও অনিয়মের ৪০টি ঘটনার সমীক্ষা শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হয়েছে। দুই খন্ডে প্রকাশিত শ্বেতপত্রে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ ১৬ জন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষেত্র বিশেষে দুর্নীতি, অনিয়ম বা ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এসব প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রায় দুই ডজন সাবেক ও বর্তমান সরকারি কর্মকর্তাকেও চিহ্নিত করা হয়েছে।

যে ১৬টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কাজে দুর্নীতি, অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ শ্বেতপত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে সেগুলো হচ্ছে– বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ সাতটি, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের পাঁচটি, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের পাঁচটি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের তিনটি, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের তিনটি, পানি সম্পদ মন্ত্রণায়ের তিনটি, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের দুটি, অর্থ মন্ত্রণালয়ের দুটি, পাট, বস্ত্র, শিক্ষা, নৌ-পরিবহন, প্রতিরক্ষা এবং ধর্ম মন্ত্রণালয়ের একটি করে ঘটনা।

এসব দুর্নীতি, অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক ক্ষতিসাধন বা আত্মসাতের ঘটনার জন্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ঐ সব মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীকে দায়ী করা হয়েছে।

দায়ী করা অন্য সাবেক মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা হলেন– স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জিল্লুর রহমান, খাদ্যমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, পানি সম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক, অর্থমন্ত্রী শাহ এমএস কিবরিয়া, শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক, শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, যোগাযোগ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন, বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর, পাট প্রতিমন্ত্রী একে ফায়জুল হক, নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মওলানা মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম এবং বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী আখম জাহাঙ্গীর, প্রতিরক্ষা, জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও দায়ী করা হয়েছে।

দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে সাইফুর রহমান ও আব্দুল মতিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে

বিগত সরকারের আমলে বেসরকারি খাতকে বঞ্চিত করে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে মোটা অংকের ঋণ নেওয়া হয়েছে। অনুৎপাদনশীল খাতে সরকারের ব্যয়ও কমানো যায়নি। দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে স্থবিরতা, বৈদেশিক মুদ্রার বিপর্যস্ত অবস্থা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মন্দাবস্থার ফলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ভয়াবহ অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে পড়তে পারে। এ অবস্থায় এতো বড়ো মন্ত্রিসভা গঠন করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত হয়নি। বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি দাতাগোষ্ঠীর ছোট ও কার্যকর সরকার ব্যবস্থা অনুসরণের নীতিমালা স্মরণ করিয়ে দেন। উত্তরে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী সাইফুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, মন্ত্রিসভার বিশালাকৃতিতে আমি নিজেও অস্বস্তি বোধ করি।

স্পিকার এন্ড ডেপুটি স্পিকার (রেমুনারেশন এন্ড প্রিভিলেজ) (এমেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৯৯-এর মাধ্যমে স্পিকারের মাসিক বেতন ১৩ হাজার ৫'শ টাকা থেকে ২১ হাজার ৫শ' টাকায় এবং ডেপুটি স্পিকারের মাসিক বেতন ১২ হাজার টাকা থেকে ২০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়। এমপিদের পারিশ্রমিক ও ভাতা (সংশোধনী) বিল '৯৯ অনুযায়ী একজন নির্বাচিত সাংসদ বেতন বাবদ ১০ হাজার টাকা ছাড়াও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ভাতা মিলিয়ে মাসে পান প্রায় ২০ হাজার টাকা। একটি টেলিফোনের পূর্ণবিল, আপ্যায়ন ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা তো রয়েছেই। এমপি হোস্টেলের কক্ষ এবং ট্যাক্সবিহীন গাড়ি আমদানিও তাদের বিশেষ সুযোগ সুবিধার অন্তর্ভূক্ত। এছাড়া সংসদের প্রতি কার্যদিবসে উপস্থিতির জন্য যাতায়াত ভাতা পান ৫শ' টাকা। লক্ষণীয় বিষয় অনুপস্থিত থাকলেও একজন সাংসদ প্রতি কার্যদিবসে পান ২শ' ৫০ টাকা। সংসদের বৈঠক, কোনো কমিটির সভা বা সংসদে কোনো সরকারি কাজের জন্য দৈনিক ভাতা পান ৪শ' টাকা। পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত একজন সাংসদের এসব সুযোগ-সুবিধা ও বেতনভাতা দিতে সরকারের ব্যয় হয় ৮০ লাখ টাকা। সে হিসেবে ৩শ' জন সাংসদের পেছনে মোট ব্যয় ন্যূনতম প্রায় ২৫০ কোটি টাকা।

সাংসদদের কাজকর্ম পরিচালনার কাজে নিয়োজিতদের বেতন ভাতা এবং সংসদ ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যয় হয় আরো অতিরিক্ত ৩৫০ কোটি টাকার মতো। প্রতি পাঁচ বছর পর অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচন পরিচালনা করতে ব্যয় হয় ২৫০ কোটি টাকা।

দৃশ্যত, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিসভার সদস্য ও সাংসদদের কাজকর্ম পরিচালনা ও তাদের বেতন ভাতা সুযোগ-সুবিধা দিতে গিয়ে সরকারের ব্যয় হয় ১৫ শ' কোটি টাকার মতো। গত বছরের ৭ জুন ঘোষিত ২০০১-২০০২ সালের বাৎসরিক বাজেটে রাজস্ব ব্যয় ১৯,৬৩৩ কোটি টাকা থেকে ২০,৬৬২ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়। অর্থাৎ প্রতি পাঁচ বছর সময়ে রাজস্ব খাতে ব্যয় দাঁড়ায় এক হাজার কোটি টাকারও বেশি। এ অর্থের একটি মোটা অঙ্ক খরচ হয়ে যায় রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনায় কর্তা ব্যক্তিদের বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা দিতে।

এত খরচে কী লাভ

অঙ্কের হিসাবে আমাদের মন্ত্রী, সাংসদদের বেতন এবং সুযোগ-সুবিধার পরিমাণ ভালো হলেও তাতে তারা সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। কেননা সেটাই স্বাভাবিক। কোটি টাকা দিয়ে মনোনয়ন কিনে, কোটি টাকা খরচে নির্বাচনে জিতে এত 'অল্প' বেতন তাদের চা খরচ জোগানোর জন্যও যথেষ্ট নয়। তারা 'টাকা বানানো মেশিন' হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেন তাদের পদ। অনেক ক্ষেত্রে ছ্যাঁচড়া চুরির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন অনেকে। ১৯৯৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমদ এমন এক চুরির তথ্য প্রকাশ করেন। তার দেয়া তথ্যে জানা যায়, গরীব রোগীর খাতায় নাম লিখিয়ে বহু মন্ত্রী, সচিব ও বিচারপতিসহ অনেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়েছেন। এই 'গরিব রোগীর' তালিকায় রয়েছেন তৎকালীন আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য কামরুজ্জামান, জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম, বিচারপতি জাকির হোসেন, সাংসদ আলতাফ হোসেন গোলন্দাজসহ শতাধিক ব্যক্তি।

আওয়ামী লীগ সংবাদ সম্মেলনে বিগত বিএনপি'র শাসনামলে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার অবৈধ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি দখল, পুলিশ বিভাগে লোক নিয়োগে অনিয়ম, দলীয়করণ, এয়ারবাস ক্রয় নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ধরেছে

এটা হচ্ছে একেবারেই খুচরো অনিয়ম। বড় বড় অনিয়ম কখনোই প্রকাশিত হয় না। চাপা থাকে লাল ফিতার ফাইলে। এবার হঠাৎ করে বিএনপি আওয়ামী লীগের রেষারেষিতে বের হয়ে এসেছে পুকুর চুরির বিভিন্ন তথ্য। জনগণ জানতে শুরু করেছে হাজার হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন দুর্নীতির কথা। প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী সাংসদরা কিভাবে 'আলাদিনের চেরাগ' ব্যবহার করছে, বের হয়ে পড়েছে এমন সব নথি। দুই পক্ষের শ্বেতপত্রের লড়াই-এ জনগণ বুঝতে পারছে ১৫০০ কোটি টাকা খরচ করে তারা কেমন চোর রেখেছে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য?

দুর্নীতির শ্বেতপত্র : দুই শ্বেতহস্তীর লড়াই

গত কয়েক বছর ধরে দেশের দুই বড় রাজনৈতিক দলের দুই নেত্রী একে অপরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনছেন প্রকাশ্যে। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার অভিযোগ '৯১-এর পর বিএনপি সরকারের আমলে খালেদা জিয়া এয়ারবাস ক্রয়ের দুর্নীতি করেছেন। কমিশন নিয়েছেন মোটা দাগে। জিয়াউর রহমান মারা যাওয়ার সময় ভাঙা স্যুটকেস আর ছেঁড়া গেঞ্জি রেখে গিয়েছিলেন। সেই ছেঁড়া গেঞ্জি আর ভাঙা স্যুটকেসের বদৌলতে কি করে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক বনে গেলেন বেগম জিয়ার পরিবার। তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন শেখ হাসিনা।

বেগম জিয়াও কম যান না। তিনিও শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ তুলেছেন। বলেছেন, 'মিগ ২৯ বিমান ক্রয়ে পারসেন্টেস নিয়েছেন হাসিনা। নৌবাহিনীর জন্য ফ্রিগেড ক্রয়েও দুর্নীতির অভিযোগ আনেন তিনি। স্বভাবতই দু'জনেই এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। নানা যুক্তি তথ্য হাজির করে দু'জনেই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন তারা দুর্নীতিবাজ নন। ধোয়া তুলসী পাতা। চাঞ্চল্যকর এসব অভিযোগের সত্যতা নিয়ে উৎসুক মানুষের যখন মাথা খারাপ হওয়ার যোগাড় ঠিক সেই সময়েই জনগণের সামনে দু'দলই হাজির হলো শ্বেতপত্র নিয়ে।

গত ২৩ জানুয়ারি মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে সংবাদ সম্মেলনে দু'পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ধরে।

বিএনপি তার নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ শাসনামলের দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ ও তার বিহিত ব্যবস্থার কথা বলেছিল। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতা গ্রহণের পর জাতির উদ্দেশে দেয়া তার প্রথম ভাষণে ঘোষিত সরকারের একশ' দিনের কর্মসূচিতে

‘দুর্নীতির সকল অভিযোগের তদন্ত, দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিচারের কাজ শুরু করা’র কথা বলা হয়েছিল। ঐ ভাষণেই বেগম জিয়া উল্লেখ করেছিলেন যে, ‘আমরা আগামী তিন মাসের মধ্যে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করব যেখানে থাকবে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে সংঘটিত দুর্নীতিগুলোর প্রাথমিক বিবরণ।’ প্রধানমন্ত্রী তার বক্তৃতায় আওয়ামী সরকারের শেষ কয়েক মাসে দেশের পত্রিকাগুলোতে যে সব দুর্নীতির খবর বেরিয়েছিল তার কিছু শিরোনামেরও উল্লেখ করেছিলেন। খালেদা জিয়ার সরকার একজন সাবেক সচিব জনাব মনিরুজ্জামানকে প্রধান করে শ্বেতপত্র একটি সেল গঠন করে। গত ২৩ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সরকারের গত পাঁচ বছরের শাসনামলের ৪০টি দুর্নীতির অভিযোগ সংবলিত প্রায় ৭৯৩ পৃষ্ঠার দুই খন্ডের এই শ্বেতপত্রটি প্রকাশ করা হয়।

বিরোধী দল আওয়ামী লীগ একই দিন সংবাদ সম্মেলন করে একটি পাল্টা শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে। এই শ্বেতপত্রে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার আত্মীয়-স্বজনসহ তেরোজন বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান এই শ্বেতপত্র প্রকাশের যুক্তি হিসেবে বলেন যে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন ব্যুরো যে সব মামলা দায়ের করেছিল, তা স্থগিত বা প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। বিএনপি নেতা-কর্মীদের এই সব দুর্নীতি যাতে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে না যায় সে জন্যই সেসব শ্বেতপত্র আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ সদ্য যোগদানকারী জাতীয় পার্টি সরকারের মন্ত্রী ও সাবেক সচিব আবুল মাল আব্দুল মুহিত সংবাদ সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে চারটি মূল বিষয়ে আলোকপাত করেন সেগুলো হচ্ছে ১. দায়ের হওয়া মামলা ও অভিযোগের তদন্ত অব্যাহত রাখা, ২. দুর্নীতি দমনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী করার জন্য স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন, ৩. ক্ষমতার অনানুষ্ঠানিক কেন্দ্রের তৎপরতা বন্ধ এবং ৪. সরকারের কলেবর ছোট করা ও দুর্নীতি তদন্তে স্ববিবেচনা প্রয়োগ না করা।

দেশের প্রধান দু'টি দল কর্তৃক পরস্পরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির এই শ্বেতপত্র প্রকাশ কার্যত শাসকদলগুলোর দুর্নীতিবাজ চেহারাকেই তুলে ধরেছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজের এই দুর্নীতি কেবল জাতীয় উদ্বেগের বিষয় নয়, আন্তর্জাতিক উদ্বেগের বিষয়ও হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বব্যাপী দুর্নীতির আলোচনায় বাংলাদেশ এখন শীর্ষস্থানে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল তার ২০০১ সালের দুর্নীতির ধারণার সূচকে বাংলাদেশকে তালিকার প্রথমে রেখেছে। ১৯৯৫-এর এই ধারণা সূচকে বাংলাদেশের স্থান ছিল চতুর্থ। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের চীফ ইকনমিস্ট ড. স্টার্ন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক আয়োজিত লোক বক্তৃতায় বাংলাদেশের দুর্নীতিকে এ দেশের উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অর্থনৈতিক মন্দাক্রান্ত বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের ব্যাপারে আইএমএফ মিশন তার সাম্প্রতিক সফরে দারিদ্র্য দূরীকরণের কৌশলে সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য দুর্নীতি বন্ধ করার শর্তারোপ করেছে। দুর্নীতি সম্পর্কে পাল্টাপাল্টি অভিযোগে একে অপরকে দুষলেও দেশের দুর্নীতিবস্থা সম্পর্কে শাসকদলগুলো নিজেরাই ওয়াকিফহাল। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাবস্থায় জাতীয় সংসদের ভাষণে খোলাখুলিই স্বীকার করেছিলেন যে দুর্নীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পরও ‘ফুয়েল না দিলে ফাইল নড়ে না।’ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সময় নিজ দলের মন্ত্রী-এমপিদেরও দুর্নীতিতে লিপ্ত না হওয়ার জন্য সাবধান করে দিয়েছেন।

হা ই লা ই ট স

আওয়ামী লীগের শ্বেতপত্র

বিএনপি'র বর্তমান ও সাবেক (১৯৯১-৯৬) শাসনামলের সরকারের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা দুর্নীতি মামলার তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার দাবি জানায় আওয়ামী লীগ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার ছেলে তারেক রহমান, ভাই সাইদ ইসকান্দার এবং বিএনপি'র ১০ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তুলে ধরেন আওয়ামী নেতারা।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে অবৈধ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি দখল, পুলিশ বিভাগের লোক নিয়োগে অনিয়ম ও দলীয়করণ, এয়ারবাস কেনা দুর্নীতি ছিল প্রধান প্রধান অভিযোগ। এছাড়া অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান, বস্ত্র মন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরী, শ্রম মন্ত্রী আবদুল্লা আল নোমান, পূর্ত মন্ত্রী মির্জা আব্বাস, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী লুৎফর রহমান খান, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী আমানউল্লাহ আমান, সাবেক খাদ্য মন্ত্রী লে. জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলী, সাবেক গণপূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, সাবেক পাট মন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) এএসএম হান্নান শাহ ও সাবেক বিমান প্রতিমন্ত্রী আব্দুল মান্নান।

প্রধানমন্ত্রীর ছেলে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে কোকো জাহাজ এবং তাজ ডিস্টিলারিজ কেনা ও রহমান শিপার্স ও ইউনিটেক্স এ্যাপারেলের নামে অবৈধ ঋণ গ্রহণ এবং সাইদ ইসকান্দারের বিরুদ্ধে ড্যান্ডি ডাইংয়ের ঋণ নেওয়ার অনিয়মের অভিযোগ জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে। এ দু'জনের বিরুদ্ধে মামলার কথাও উল্লেখ করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন, সমূলে দুর্নীতি উৎপাটনের কথা বলে বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এলেও ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে থেকেই শুরু হয়েছে তাদের ব্যাপক দুর্নীতি। টাকার বিনিময়ে বিএনপি'র মনোনয়ন বিক্রি এবং মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়ার জন্য খালেদা জিয়া ও তার ছেলে তারেক রহমানকে টাকা দেওয়া এখন ব্যাপক আলোচনার বিষয় বলে জিল্লুর রহমান তার লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, উপ-নির্বাচনে অংশ নিতে ঋণখেলাপির তালিকা থেকে নিজেদের নাম বাদ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর ভাই সাইদ ইসকান্দার, অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের ছেলে নাসের রহমান ও রাষ্ট্রপতির ছেলে মাহী বি. চৌধুরীর রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ঋণ পুনঃতফসিল করার খবর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিমের বিরুদ্ধে প্রকাশিত শ্বেতপত্রে ব্যাপক আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ আনা হয়েছে

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিক সংগ্রামে দুর্নীতি দমন সব সময় অন্যতম প্রধান ইস্যু ছিল। ঐতিহাসিক একুশ দফার এটা ছিল অন্যতম দফা। মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী তার রাজনৈতিক সকল ইশতেহারে 'ঘুষ দুর্নীতি বন্ধ' করার বিষয় উল্লেখ করতেন। সভা সমিতিতেও তিনি এ ব্যাপারে বজ্রকণ্ঠ ছিলেন। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে আইয়ুবের মৌলিক গণতন্ত্রী ব্যবস্থার দুর্নীতিবাজ সদস্যদের জনগণ চিহ্নিত করে শাস্তি প্রদান করেছিল।

বাংলাদেশ-উত্তরকালে আওয়ামী লীগ তার নবলব্ধ ক্ষমতাকে দুর্নীতি ও সম্পদ সংগ্রহের কাজে লাগামহীনভাবে ব্যবহার করে। অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছিল যে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে খেদ করে বলতে হয়েছিল, 'আমি ভিক্ষা করে যা কিছু আনি, চাটাল দর সব চেটে নিয়ে যায়।'

সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান দুর্নীতির নতুন রূপ দিয়েছিলেন 'মানি ইজ নো প্রব্লেম' এই স্লোগানে। নিজের একটি সৎ ব্যক্তি ইমেজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেও জিয়াউর রহমানই দুর্নীতিকে দৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রদান করেন। আওয়ামী লীগের অভিযোগ যে জিয়াউর রহমান ভাঙা স্যুটকেস, ছেঁড়া গেঞ্জি রেখে গিয়েছিলেন বলে প্রচার করা হলেও, এখন তার সেই ভাঙা স্যুটকেসই রূপান্তরিত হয়েছে বড় বড় শিল্পে। ছেঁড়া গেঞ্জি বেগম জিয়ার দামী শিফনের শাড়িতে।

জিয়াউর রহমানের দুর্নীতিবাজ ব্যবস্থার এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে এরশাদ দুর্নীতিকে কার্যত এক শিল্পের রূপ প্রদান করেন। এরশাদের পতনের পর তার বাড়ির আলমারিতে রক্ষিত স্ত্রীর শাড়ির ভাঁজেই দেড় কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছিল। মার্কোসের মত এরশাদও বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও অর্থ আত্মসাত করে বিদেশে পাচার করেছিল। ১৯৯৫ সালের ২৫ জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়ার জেলে বসে অবলুপ্ত বিসিসিআই ব্যাংকের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি সালেহ নকভী এই মর্মে একটি হলফনামা প্রদান করেন যে কেম্যান দ্বীপের ব্যাংকে এক সময় এরশাদের ১৩/১৪ মিলিয়ন ডলার ছিল। সেখান থেকে তার নির্দেশে তার আরেক স্ত্রী মরিয়ম মমতাজের অ্যাকাউন্টে ১০ মিলিয়ন ডলার দুই কিস্তিতে স্থানান্তর করা হয়েছিল। পরবর্তীতে জানা গেছে যে, কেবল এই ব্যাংকে নয়, বিদেশের অন্যান্য ব্যাংকেও তার অ্যাকাউন্ট ছিল যার ব্যবস্থা করার জন্য জেল থেকে বেরিয়েই সে দ্রুত বিদেশ সফরে যায়।

ত্রিশ বছরের ইতিহাসে একমাত্র রাষ্ট্রপতি এরশাদেরই দুর্নীতির দায়ে বিচার হয়েছে। এরশাদের দুর্নীতির বিচার করতে সরকার আন্তরিক ছিল। রাজনৈতিক হীনস্বার্থ উদ্ধারের জন্য দুর্নীতির শ্বেতপত্র নয়। বিচার কার্য পরিচালনার জন্য দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ করতে হবে

এরশাদের এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে এরশাদ বিরোধী গণআন্দোলনের সময় প্রথমে পাঁচ দল, পরে তিন জোটের তরফ থেকে এরশাদের দুর্নীতির তদন্ত, আত্মসাতকৃত অর্থ আদায় ও বিচারের কথা বলা হয়েছিল। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের অন্তর্বর্তী সরকার এরশাদ শাসনামলের দুর্নীতি সম্পর্কে পুলিশ কমিশনের রিপোর্টে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছিল। এরশাদের দুর্নীতি তদন্ত করার জন্য 'ফেয়ার ফ্যাক্স' নামের একটি আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থাও নিয়োগ করা হয়। এর পেছনে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করা হলেও বিএনপি শাসনামলে এসে 'ফেয়ার ফ্যাক্স'-এর তদন্ত সম্পর্কে আর কিছু জানা যায়নি। বিএনপি সরকার ঐ তদন্তে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এরশাদের বিরুদ্ধে ২১টি মামলা দায়ের করা হলেও সে ব্যাপারে সরকার আর বিশেষ আগ্রহ দেখায়নি। অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছিল যে জনতা টাওয়ার-এর মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এরশাদের বিরুদ্ধে দেয়া নিম্ন আদালতের যে মামলার রায় বহাল রেখেছে সে সময়কার অ্যাটর্নি জেনারেল আমিনুল হক বহু চেষ্টা করেও হাইকোর্টে ঐ মামলার শুনানি করাতে পারেনি। অ্যাটর্নি জেনারেল আমিনুল হক ঐ মামলার শুনানি করতে ব্যর্থ হয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কোর্ট প্রাঙ্গণেই মৃত্যুবরণ করেন।

এরশাদের বিরুদ্ধে ঐ সব মামলার শুনানি হয়নি তো বটেই, গত দশ বছরে পালা করে ক্ষমতায় আসীন বিএনপি-আওয়ামী লীগ এরশাদকে দলে ভেড়াতে তাকে নিয়ে লোফালুফি করেছে। এখনও এরশাদকে তাদের তুরুপ হিসাবে রেখে দেয়া হয়েছে প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য।

শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়াসহ তার মন্ত্রী-কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা দিয়েছে। কিন্তু কোনো মামলারই বিচার হয়নি। আওয়ামী লীগ দাবি করেছে যে তারা আদালতের ওপর হস্তক্ষেপ করেনি। কিন্তু বিভিন্ন ঘটনা প্রমাণ করেছে যে দুর্নীতির অপরাধের জন্য নয়, রাজনৈতিক লক্ষ্য থেকেই ঐসব মামলা দায়ের হয়েছিল। বিএনপি সরকারও বর্তমানে যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট। কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে মামলা আনতে হবে। না হলে ভিত্তিহীন

উল্লেখযোগ্য ১০ অভিযোগ

বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

- অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি দখল
- এয়ার বাস ক্রয়ে দুর্নীতি
- কোকো জাহাজ ক্রয় ও তাজ ডিস্টিলারিজ, রহমান শিপার্স এবং ইউনিটেক্স এ্যাপারেলের নামে অবৈধভাবে ঋণ গ্রহণ করে দুর্নীতি
- ডান্ডি ডায়িং-এর নামে অবৈধভাবে ব্যাংক ঋণ গ্রহণ
- পুলিশের এসআই পদে দুর্নীতির মাধ্যমে লোক নিয়োগ
- রাজউকের জমি বরাদ্দ নিয়ে দুর্নীতি, বাণিজ্য প্লটকে শিল্প প্লট হিসেবে বিক্রি করে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ
- আদমজী কোর্ট প্রাঙ্গণে নতুন বন নির্মাণে দুর্নীতি, মেসার্স গজরাজ পান্নালাল নামীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বিক্রয়ে দুর্নীতি
- দুর্নীতির মাধ্যমে নামে বেনামে বিপুল সম্পত্তির মালিক হওয়া
- টেউটিন ক্রয়ে দুর্নীতি
- খিলগাঁও পুনর্বাসন এলাকায় ১৭টি প্লট বরাদ্দ নিয়ে দুর্নীতি

অপবাদের জন্য সংক্ষুব্ধ কেউ মানহানির মামলা করে দিতে পারে। আওয়ামী লীগ বিএনপি'র শ্বেতপত্রের বিরুদ্ধে সে ধরনের মামলা করার হুমকি দিয়েছে। অন্যদিকে বিএনপি দাবি করছে দুর্নীতির এই অভিযোগের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণতা কোনোক্রমেই যুক্ত নয়। বিএনপি'র বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করা হবে না। দুর্নীতির দলিল হিসেবেই ঐ শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হয়েছে।

শাসকদলগুলোর দুর্নীতির পাল্টাপাল্টি অভিযোগ সম্পর্কে টিআইবি ট্রাস্টি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেছেন দুর্নীতির সংজ্ঞা নির্ধারিত না করে বা বিশ্লেষণ না করে কেবল কতকগুলো সরকারি নথি সংকলিত করা হয়েছে শ্বেতপত্রে। সরকারের জবাবদিহিতা এতে প্রতিষ্ঠিত হবে না। তবে এর ইতিবাচক দিকটি হচ্ছে এর মধ্য দিয়ে জনগণের তথ্য জানার অধিকার সরকার স্বীকার করে নিয়েছে। জনগণ এটা পড়ে নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

এদিকে বাংলাদেশের দুর্নীতি সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের অভিমত যে ঐ দুর্নীতি যদি কমিয়ে ভারতের পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব হয় তবে বাংলাদেশের জিডিপি শতকরা দুইভাগ বেড়ে যাবে। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ২০২০ সালে শতকরা ১১%-এ নেমে আসবে। বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠান মোটেই স্বাধীন নয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে তাকে পৃথক করার কথা বলা হলেও দুর্নীতি দমন ব্যুরো প্রধানমন্ত্রীর অফিসের সরাসরি অধীন এবং তার নির্দেশ মতোই কাজ করে। সে কারণেই 'দুর্নীতি তদন্তে' স্বাধীন কমিশন গঠনের কথা এসেছে। ন্যায়পাল নিয়োগের কথাও এসেছে।

এসব সৎ উপদেশ নতুন নয়। কিন্তু চোরে না শুনে ধর্মের বাণী। আমাদের রাজনীতিবিদরাও সেরকম। তারা এসব ভালো কাজ করতে চাইবেন না। এরা আছেন শুধু নিজেদের আখের গোছানোর কাজে। প্রায় প্রতিটি সাংসদ কোটিপতি হলেও অর্ধেকেরও কম সংখ্যক সাংসদ আয়কর দেন। সপ্তম জাতীয় সংসদের ৩শ' জনের মধ্যে মাত্র ১৪৯ জন ছিলেন আয়করদাতা। অথচ এদের অধিকাংশই ১৯৯৮ সালে রাজউকের প্লট পাবার আশায় আয়কর রিটার্ন জমা দিয়ে টিআইএন (ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নম্বর) সংগ্রহ করেন। প্লটের আবেদনে টিআই নম্বর তখন বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছিল। তাই সাংসদরা এ কষ্টটা করেছিলেন। আয়কর বিভাগে অনুসন্ধান করে জানা গেছে, বর্তমান সাংসদদের অর্ধেকেরও বেশি আয়কর দাতা নন, এই হচ্ছে আমাদের 'সম্মানিত সংসদ সদস্যদের' অবয়ব। তারা শুধু সুযোগের সন্ধানে থাকেন। দুর্নীতিই যেন তাদের মূল নীতি হয়ে পড়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

দুর্নীতি দায়ে অভিযুক্ত শীর্ষ ১০ প্রকল্প

- রাশিয়া থেকে মিগ-২৯ জঙ্গি বিমান ক্রয়।
- বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর সাবমেরিন ক্যাবল নির্মাণ
- অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য ক্রয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি
- সমুদ্রবন্দরে খাদ্যশস্য খালাসে অনিয়ম
- রাজউকের প্লট বরাদ্দে অনিয়ম
- চট্টগ্রাম বন্দরের টাগবোট ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি
- বিটিএমসি'র সম্পত্তি হস্তান্তরে দুর্নীতি
- মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্পে অনিয়ম-দুর্নীতি
- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক অনিয়ম
- পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ড্রেজার ক্রয়ে গুরুতর অনিয়ম

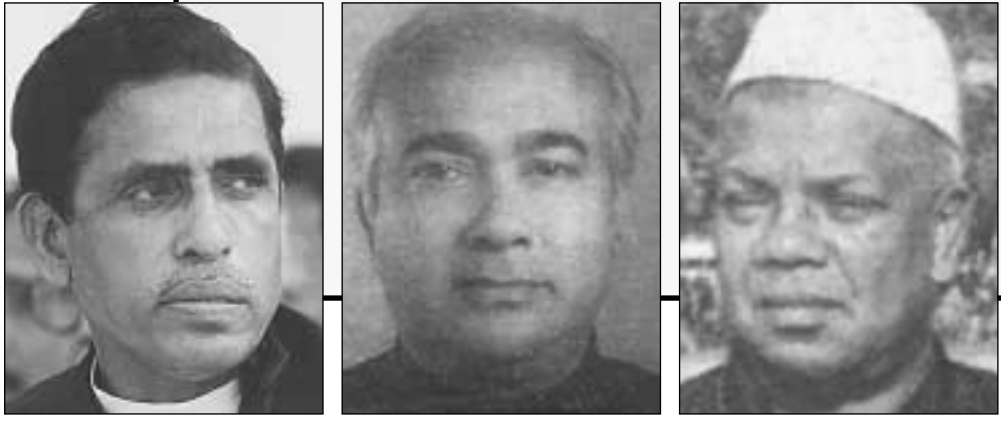

প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে

শ্বেতহস্তী বলতে চাই না

গত সরকারের একজন নন আওয়ামী মন্ত্রী এক আড্ডায় বলছিলেন মন্ত্রীদের দুর্নীতির কথা। প্রথম মন্ত্রিসভায় তিনি দেখেন কোনো মন্ত্রীর স্যুট তেমন ফিট করছে না। জুতাটাও নতুন নয়। প্রধানমন্ত্রীর কানে, গলায় হাল্কা সোনার অলঙ্কার। তিন মাস যেতেই পাল্টে যায় চিত্র। মিটিং-এ যেন দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ছে। রসিক সেই মন্ত্রী বলেন, আমি চোখ কচলে পরিষ্কার করে প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখি সোনা হয়ে গেছে হীরা। আর মন্ত্রীরা যেন এক একজন ফ্যাশন মডেল। সব ব্র্যান্ডেড স্যুট-কোট পরা। ফরাসী দুর্লভ সুগন্ধীতে রুমটি ছেয়ে আছে। আলাদীনের আশ্চর্য চেরাগ রাতারাতি পাল্টে দিয়েছে সব কিছু।

মন্ত্রী, সাংসদদের এমন দুর্নীতিতে জনগণ হতাশ হয়ে পড়ছে। তারা ভাবতে বাধ্য হচ্ছে আসলেই কি আমাদের ১৫০০ কোটি টাকা বিফলে যাচ্ছে। কতকাল চলবে এমন ধারা? এই একই চিন্তার জন্য মনে হচ্ছে নির্বাচিত প্রতিনিধি, মন্ত্রীরা এক একটি শ্বেতহস্তী। বৃহৎ পরিসরে বলা যায় রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। হচ্ছে এক একটি শ্বেতহস্তী।

এই ভাবনা অমূলক নয়। আবার এই ভাবনা হৃদয়ে গেঁথে গেলে তা গণতন্ত্রের জন্য কখনোই শুভ হবে না। আমরা চাই রাজনৈতিক দলগুলো তাদের 'শ্বেতহস্তী' ইমেজ কাটিয়ে উঠবে। আলাদীনের চেরাগে নিজেদের নয় দেশের উন্নয়ন ঘটাবেন।